সংবাদ

তারিখ 28 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 7

: শনিবার ১৪ আষাঢ় ১৪১৫
ka : Saturday 28 June 2008

সম্পাদকীয়

এমপিওভুক্তি এবং শিক্ষার রাজনীতিকরণ

দেশের বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোর এমপিও (মাছলি পেমেন্ট অর্ডার) ভুক্তি নিয়ে শিক্ষা খাতে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা, শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্র ভর্তি থেকে শুরু করে সর্বস্তরেই দুর্নীতির প্রসার ঘটেছে। এর অন্যতম একটা দিক হলো সরকারের অনুমোদন পেতে রাজনীতিকদের দুর্নীতি ও ব্যবসা। এসবেরই সহযোগী হলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একশ্রেণীর কর্মকর্তা। নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি পুরনো যেসব প্রতিষ্ঠান সুনামের সঙ্গে স্কুল-কলেজ পরিচালনা করছিল সেগুলোও দুর্নীতির খপ্পরে পড়ে গেছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ১৯৯৫ সাল থেকে এমপিওভুক্ত করে সরকারি অর্থ বরাদ্দের প্রথা পুরোপুরিভাবে শুরু হয়। প্রথম দিকে একটা নীতিমালা অনুসরণ করে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক মূল বেতনের ৬০ শতাংশ পেতেন। বাকি টাকাটা ছাত্রছাত্রীদের টিউশন ফি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য আয় থেকে দেয়ার কথা। কিন্তু কোন স্কুল বা মাদ্রাসাই সরকারি টাকার বাইরে কোন টাকা দিত না। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্দোলনের মুখে পর্যায়ক্রমে সরকারি অংশ বাড়িয়ে ২০০৬ সাল থেকে শিক্ষকদের বেতনের শতভাগই সরকার দিতে শুরু করে। মূল বেতনের সঙ্গে চিকিৎসা ও বাড়ি ভাড়া বাবদ ২৫০ টাকা সরকার দিয়ে থাকে। আমাদের এক সহযোগী দৈনিকে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪ লাখ ৭৩ হাজার ৮৮০ শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত হিসেবে সরকার বেতন-ভাতা দিচ্ছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের পেছনে সরকারের ব্যয় হয়েছে ৪ হাজার ৩৩৭ কোটি টাকা। জুলাই মাস থেকে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর মতো বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা ২০ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পাবেন। এ জন্য বছরে ৫৮২ কোটি টাকা বাড়তি খরচ হবে। চলতি অর্থবছরে শিক্ষা খাতে মোট রাজস্ব বাজেটের ৫২ শতাংশ ব্যয় হয়েছে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবদ।

সরকারি নীতি অনুযায়ী সারাদেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হওয়া উচিত ২৪ হাজার ২শ'। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এবং বিভিন্ন ঘাটে অর্থ প্রদান করে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬ হাজার ৩৭০টি। অর্থাৎ জনসংখ্যার অনুপাতে সরকারি হিসাবেই ২ হাজার ১০০টি অতিরিক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলোর বোঝা সরকারকে বহন করতে হচ্ছে। এমপিওভুক্ত হলে একটি স্কুলে ৮ জন এবং কলেজ ও মাদ্রাসায় ১০ থেকে ২০ শিক্ষক-কর্মচারীকে সরকার বেতন-ভাতা দেয়।

এমপিওভুক্তি প্রাথমিক প্রক্রিয়া হলো যেনতেনভাবে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো। এমপিওভুক্তির আশ্বাস দিয়ে মোটা অঙ্কের 'চাঁদা' নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া এবং তার নাম শুধু কাগজে-কলমে রাখা হয়। এরপর ছাত্র ভর্তি ও অবকাঠামো নির্মাণের তোড়জোড় চলে। তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য পাঠদানের অনুমতি এবং এসব সংগঠিত হলে একাডেমিক স্বীকৃতি দেয়া হয়। তারপর শুরু হয় এমপিওভুক্তির জন্য দৌড়ঝাঁপ ও তদবির। অবশ্য একাডেমিক স্বীকৃতি পেতেও অনেক স্কুলকে নানা ধরনের মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে হয়। যেসব স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসা বিধিবহির্ভূতভাবে গড়ে তোলা হয় তাদের ক্ষেত্রেই দুর্নীতি হয় সরকারের বেশি। নিয়োগ বাণিজ্যের মাধ্যমে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে অনেক অভিযোগ আছে।

দেশে এমপিওভুক্ত অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলোর ছাত্র বা ছাত্রী সংখ্যা শিক্ষকের সংখ্যার চেয়ে কম। অনেক মাদ্রাসা আছে যেগুলোর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কম। এসব প্রতিষ্ঠানে ভুয়া ছাত্রছাত্রীদের নাম দিয়ে সরকারের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়। তেমনি ছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকা ভুয়া ছাত্রী দেখিয়ে মেরে দেয়া হয়। প্রায় প্রতিটি এমপিওভুক্ত মাদ্রাসার ছাত্র বা ছাত্রীর সংখ্যা নীতি অনুযায়ী কম। অনেক কলেজ, স্কুল বা মাদ্রাসা থেকে পাবলিক পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থী পেতে বেগ পেতে হয়। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীদের পাসের সংখ্যা শূন্য অথবা ৫ জনের চেয়ে কম। এসব প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বাতিল করার পরও রাজনৈতিক প্রভাব ও নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করে তা আবার বহাল করা হয়েছিল। এসএসসি ও সমমানের মাদ্রাসা পরীক্ষার পর এবার খারাপ ফলের জন্য এমপিওভুক্তি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এইচএসসি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে তা করা হতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে অটল থাকা নিয়ে প্রশ্ন আছে। দেশের অন্যান্য খাতের মতো শিক্ষা খাতেও দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এমপিওভুক্তি নিয়ে রাজনীতি, ব্যবসা ও দুর্নীতি তারই লক্ষণ। শিক্ষা খাতকে দুর্নীতিমুক্ত করাটা সহজ হবে না।